Vol. 33 | No. 1 | 1989

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা গদ্য ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

Volume	33
Issue	1
Year	1989
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	শিপ্রা দস্তিদার
Published online	October 1, 1989
DOI	10.62328/sp.v33i1.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v33i1.2
Pages	28-58
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাংলা গদ্য ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

শিপ্রা দস্তিদার

প্রায় একশ ছয় বছর আগে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) বাংলা গদ্যের তিনটি রূপের কথা বলেছিলেন,

> আমাদের দেশে সেকালে ভদ্রসমাজে তিন প্রকার বাংলা ভাষা চলিত ছিল। মুসমান নবাব ও ওমরাহদিগের সহিত যে-সকল ভদ্রলোকের ব্যবহার করিতে হইত, তাঁহাদের বাংলায় অনেক উর্দু শব্দ মিশানো থাকিত। যাঁহারা শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহাদের ভাষায় অনেক সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হইত। এই দুই ক্ষুদ্র সম্প্রদায় ভিন্ন বহু সংখ্যক বিষয়ী লোক ছিলেন। তাঁহাদের বাংলায় উর্দু ও সংস্কৃত দুই মিশানো থাকিত। কবি ও পাঁচালিওয়ালারা এই ভাষায় গীত বাঁধিত। মোটামুটি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, বিষয়ীলোক ও আদালতের লোক এই তিন দল লোকের তিন রকম বাংলা ছিল। বিষয়ী লোকের যে বাংলা তাহাই পত্রাদিতে লিখিত হইত, এবং নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ঐরূপ বাংলা শিখিলেই যথেষ্ট মনে করিত।[১]

সহজাত অভিজ্ঞতা থেকে হরপ্রসাদ এই উক্তি করেছিলেন। পরবর্তীকালে বাংলা ভাষার আলোচনা এবং অন্যান্য প্রসঙ্গেও এই তিন রকমের ভাষার কথা তিনি একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। তবে কোন প্রসঙ্গেই তিনি এই তিন রকমের ভাষার কোন উদাহরণ দেন নি। আমরা জানি, বাংলা ভাষা, বাংলা ব্যাকরণ ইত্যাদি নিয়ে তিনি বিশেষ চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন। "মুসলমানী বাংলা", "নূতন কথা গড়া" ইত্যাদি বিষয়েও তাঁর ভিন্নরকম প্রস্তাব ছিল। পরিভাষা নির্মাণে শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি বা রুচিকে তিনি প্রশ্রয় দেন নি। সামগ্রিকভাবে তাঁর রচনারীতি, ভাষাভঙ্গি ও ভাষা-আদর্শ বিচারের পূর্বে বাংলা গদ্যের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন।

বাংলা গদ্যের ইতিহাস রচয়িতারা উনিশ শতকের প্রারম্ভে যথাযথ গদ্য-চর্চার সূচনার কথা বিশেষভাবে বলেছেন; পূর্বকথা হিসেবে তাঁরা ষোল শতক থেকে বাংলা সাধু গদ্যের প্রতিচ্ছবির কথা বলেছেন। চিঠিপত্রে সতেরো শতকের গদ্যের নিদর্শনও কিছু কিছু পাওয়া যায়। কারো কারো অভিমত, সতেরো শতকের অনেক আগেই বাংলা সাধু গদ্যের কাঠামো তৈরী হয়েছিল এবং আঠারো শতকের প্রথমদিকে বাংলা গদ্যের সাহিত্যিক রূপের নিদর্শনও অপ্রতুল নয়।[২] চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ ও কড়চা জাতীয় রচনায় এই গদ্যের বিকাশ ঘটছিল ধীরে ধীরে।

বাংলা গদ্যে রীতির যে-বৈচিত্র্য ছিল, সে সম্পর্কে হরপ্রসাদ পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন। বাংলা গদ্যের যে-শ্রেণীকরণ তিনি করেছেন, তাতে তারই আভাস পাওয়া যায়। আধুনিক গবেষকদের আবিষ্কারের মধ্যে হর-প্রসাদের অনুমানের দৃঢ় সমর্থন রয়েছে। সহজাত প্রজ্ঞাবলে তিনি যা উচ্চারণ করেছিলেন গবেষণার সন্ধানী আলো ফেলে, বহিরাগত প্রভাবের পলিমাটির স্তরভেদ করে বাংলা গদ্যের দেশজ ভূমি ও শিকড়ের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে

ষোল শতক থেকে আঠারো শতকের মধ্যে বহিরাগত প্রভাবমুক্ত বাংলা গদ্যের নিজস্ব যে কাঠামোর কথা সাধারণভাবে বলা হয়েছিল তা আজ আর কোন অনুমান নয়। ষোল শতকের রচনা ''সেকশুভোদয়া' ও 'শূন্য পুরাণে'র গদ্যভাষা সচেতন রচনা নয়; তবে গদ্যপদ্যমিশ্রিত রচনার মধ্য-দিয়েই গদ্যের রূপ নির্মিতি ঘটছিল।[৩] এই ধারা আঠারো শতকে এসে কথ্যধর্মী সাবলীল গদ্যে পরিণত হয়। অথচ বাংলাভাষার এই স্বাভাবিক গতি ও প্রকৃতি বিদেশী লেখকদের হাতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল।[৪]

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ পর্বের ইউলিয়ম কেরী এবং তাঁর সহযোগী পণ্ডিত ও মুনশীরা যে গদ্যভাষা নির্মাণ করেছিলেন তা ছিল স্বাভাবিক প্রবাহ থেকে অনেকখানি বিচ্ছিন্ন। কারণ তাঁরা পূর্ববর্তী ধারায় গদ্যরচনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন।[৫] হরপ্রসাদ প্রমাণ ও প্রস্তুতি-নিরপেক্ষ যে মন্তব্য করে-ছিলেন তার সমর্থনে আধুনিক গবেষকের উক্তি এই;

> বাংলা গদ্যে বৃটিশ প্রভাব কার্যকর হওয়ার আগেই, অন্তত আঠার শতকে, উত্তর বাংলার কোচবিহার থেকে শুরু করে ভাগীরথী-তীর পর্যন্ত গদ্য ভাষার একটি রূপ প্রচলিত ছিল।[৬]

প্রায় তিন শত বছরের সচল ধারা পেছনে ফেলে উনিশ শতকের শুরুতে ইংরেজের প্রত্যক্ষ অভিভাবকতায় বাংলা গদ্যের নবযাত্রা শুরু হয়েছিল। "এ যাত্রায় অনেক বিত্ত সংগৃহীত হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু ঘরের অনেক দিনের সঞ্চয়ও হারিয়ে গিয়েছিল।"[৭] ঘরের সঞ্চয়ের কথা হরপ্রসাদ বিশেষ ভাবে মনে রেখেছিলেন। তাই উনিশ শতকে যে আয়োজন শুরু হয় তাকে হরপ্রসাদ প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করতে পারেন নি। ইংরেজের চেষ্টায় বাংলাগদ্য রচনার আয়োজনকে তিনি 'দুভার্গ্য' বলেছেন।[৮]

বস্তুত উনিশ শতকের আনুষ্ঠানিক আয়োজনের বহু আগে ষোল শতক থেকে পর্তুগীজ পাদরিদের চেষ্টায় ধর্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলা গদ্যে গ্রন্থ রচনার চেষ্টা হয়েছিল। পরে অন্য মিশনারীরাও এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠা হয়। একই বছরে কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলাভাষা শেখানোর উদ্দেশ্য নিয়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। বিশেষত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের পরিশ্রমে পাঠ্য বইয়ের মাধ্যমে বাংলাগদ্যের একাধিক রীতির প্রকাশ ঘটে।

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরের পাদরিদের চেষ্টায় প্রকাশিত 'সমাচারদর্পণ' পত্রিকা সাময়িক পত্র হিসেবে বাংলা গদ্যের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

তারপরেই বাংলা গদ্যে স্পষ্ট ও বেগবান একটি ধারা সংযোজিত হল রামমোহন রায়ের (১৭৭৪-১৮৩৩) আবির্ভাবে। তাঁর স্পষ্ট ও সরল রচনাভঙ্গি পাঠ্য বইয়ের গদ্যশৈলীকে পাশ কাটিয়ে একটি স্বতন্ত্র ধারা তৈরী করতে সমর্থ হয়েছিল।

রামমোহনের পরে বাংলাগদ্যের শ্রেষ্ঠ নির্মাতা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১)। 'বেতালপঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭) প্রকাশের মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগর বাংলাগদ্যে নতুন সুসমা এবং সামঞ্জস্য ঘটালেন। 'শকুন্তলা' (১৮৫৪), 'সীতার বনবাস' (১৮৬০) ইত্যাদি রচনা সাহিত্যরসযুক্ত বাংলা গদ্যের নিদর্শন।

এই পর্বেরই মাঝখানে প্যারীচাঁদ মিত্রের (১৮১৪-৮৩) 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও কথ্য ভাষাশৈলী নতুন মাত্রা যোগ করেছিল বাংলা গদ্যের ধারায়।

১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রকাশ বাংলা গদ্যে নবযুগের সূচনা করে। বঙ্কিমচন্দ্রের অপ্রতিহত ঔপন্যাসিক প্রতিভা বাংলা গদ্যকে মহীরুহের বিস্তার দিয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের শৈলীকে আত্মস্থ করে রবীন্দ্রনাথ গল্প, প্রবন্ধ ও উপন্যাসের ভাষায় বার বার নতুন গতি ও ব্যঞ্জনা আরোপ করে তার মোড় ফিরিয়ে দিয়েছেন, কাব্যচিন্তার মতই তাঁর গদ্যভাষাও ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে সীমা অতিক্রম করেছে।

বাংলা গদ্যের এই সবগুলো ধারার সঙ্গেই হরপ্রসাদ পরিচিত ছিলেন। ১৮৮৬-১৮৯৪ পর্যন্ত বেঙ্গল লাইব্রেরির অধ্যক্ষ থাকা অবস্থায় সব ধরনের গদ্যরচনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। কিন্তু তিনি এইসব ধারার কোনটিকেই পুরোপুরি অনুসরণ করেন নি। সুকুমার সেনের ভাষায়,

> যাঁহারা বঙ্কিমের রীতিকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়া নিজস্ব ষ্টাইল খাড়া করিতে পারিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বিশিষ্ট হইতেছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১)।[৯]

অথবা

> হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর (১৮৫২-১৯৩১) লিপিভঙ্গি সরল ও সরস এবং নিজস্ব। পাণ্ডিত্যের বোঝা ইহার কম ছিল না; কিন্তু গুরু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতই ইঁহার লেখনী পাণ্ডিত্যভারে কুণ্ঠিত হয় নাই।[১০]

বঙ্কিমচন্দ্রের শৈলীকে আত্মসাৎ করার মত ক্ষমতা যে তাঁর ছিল তা তাঁর সাহিত্যকর্ম বিচার প্রসঙ্গে পরিস্ফুট হয়েছে। কিন্তু প্রচলিত বাংলা গদ্যের কোন বিশেষ ধারা অনুসরণ না করে নিজস্ব সরস ভঙ্গি তৈরী করে নেওয়ার কৌশল নিহিত রয়েছে বাংলা ভাষা প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃত অংশে। যে তিন রকমের প্রচলিত বাংলা গদ্যরীতির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে বিষয়ীলোকের ভাষার প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ দুর্বলতা। বস্তুত হরপ্রসাদ এই বিষয়ীলোকের ভাষাকে আশ্রয় করে নিজস্ব স্টাইল তৈরী করেছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ সেন সংকলিত 'প্রাচীন বাংলা পত্র সংকলনে'র একটি পত্রের কিছু অংশ উদ্ধৃত করে প্রমথনাথ বিশী দেখিয়েছেন যে হরপ্রসাদ-বর্ণিত বিষয়ী-

লোকের ভাষাই তাতে প্রতিফলিত হয়েছে।[১১] হরপ্রসাদের মতে কথকরা বিষয়ীলোকের ভাষায় কথকতা করতেন; সংস্কৃতব্যবসায়ী হলেও কথকদের ভাষা ছিল মুখের ভাষার একান্ত কাছাকাছি। প্রমথনাথ বিশীর মতে ঈশ্বরগুপ্ত প্রমুখ সাংবাদিক এই ভাষাই অবলম্বন করেছিলেন।

অন্যদিকে ইংরেজদের উদ্যোগে বাংলা লেখার যে চেষ্টা শুরু হয় তার দায়িত্ব পড়েছিল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ওপরে। তাঁরা দেশে কোন্ ভাষা চলিত আর কোন্ ভাষা অচলিত তা কিছুই বুঝতে চাইতেন না। বৃহত্তর জন-গোষ্ঠির মুখের ভাষার সঙ্গে তাঁদের কোন যোগ ছিল না। হরপ্রসাদের ভাষায় তাঁরা 'পণ্ডিতস্বভাবসুলভ দাম্ভিকতা সহকারে' বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা না করে পাঠ্যবই রচনায় মনোযোগ দেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পৃষ্ঠ—পোষকতায় পণ্ডিতদের হাতে যে ভাষার সৃষ্টি হল তা হরপ্রসাদের মতে,[১২]

> রাশি রাশি সংস্কৃত শব্দ বিভক্তি পরিবর্জিত হইয়া বাংলা অক্ষরে উত্তম কাগজে উত্তমরূপে মুদ্রিত হইয়া পুস্তক মধ্যে বিরাজ করিতে লাগিল।

দুর্বোধ্য, সংস্কৃত শব্দবহুল ভাষার নমুনা হিসেবে হরপ্রসাদ বিদ্যাসাগরের 'জীবনচরিত' (১৮৪৯) এবং অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় প্রথম ভাগ (১৮৭০) থেকে উদাহরণ দিয়েছেন। জটিল ইংরেজিপন্থী বাংলার উদাহরণ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ থেকে। যেমন,

> হরমোহিনী এখন সুচরিতাকে তাহার পূর্বের সমস্ত পরিবেষ্টন হইতে ছাড়াইয়া লইয়া সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্ত করিতে চান।[১৩]

রবীন্দ্রনাথের গদ্যভঙ্গির সমালোচনা করতে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হন নি। কারণ তাঁর মতে,

> বাংলা যখন একটা ভালো ভাষার মধ্যেই দাঁড়াইতেছে তখন উহা কিছু পরিমাণে শিক্ষা করা আবশ্যক। উহার একটা স্বতন্ত্র ব্যাকরণ আছে, স্বতন্ত্র পদযোজনার প্রণালী আছে। পদ বাছিয়া লইবার প্রণালী আছে।[১৪]

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গদ্যের সংস্কৃতপ্রিয়তা, মুসলমানী শব্দ নিয়ে পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের দ্বিধাগ্রস্ততা, ইংরেজিনবিশদের রচনায় বিদেশী ভাবের

অনুবাদ ও দ্বিভাষী পদক্রম ইত্যাদি প্রসঙ্গ তুলে বার বার হরপ্রসাদ মুখের ভাষার রীতি এবং বাংলা গদ্যের নিজস্ব গতি সম্পর্কে পাঠক ও লেখকদের সচেতন করে দিতে চেয়েছেন; কারণ, তাঁর সামনে ছিল দেশজ-শৈলীর সম্পন্ন একটি ধারা। যে ধারার কথা মনে রেখে ভাষা-চিন্তায় তিনি জোর দিয়েছেন সাধারণ জনবৃত্তের অধিকাংশের মুখের ওপর। এরকম ভাষাচিন্তা ও আদর্শ নিয়ে হরপ্রসাদ সাহিত্যরচনা শুরু করেছিলেন। শুরুতেই নিজস্ব প্রত্যয়সমৃদ্ধ একটি শৈলী তাঁর আয়ত্ত ছিল, এমন নয়; 'বঙ্গদর্শন'-পর্বের রচনায় বঙ্কিমের প্রভাব ছিল প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট। বিকাশের একটি স্তর অতিক্রম করে হরপ্রসাদের ভাষাশৈলী স্বতন্ত্র পথ তৈরী করে নিয়েছিল। নিজস্ব গদ্যশৈলী আয়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা-বহির্ভুত মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন "নূতন কথা গড়া" ('বঙ্গদর্শন', জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৮), "বাংলা ভাষা" ('বঙ্গদর্শন', শ্রাবণ, ১২৮৮) ও "অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সাহিত্য শাখায় সভাপতির সম্বোধন" ('সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', চতুর্থ সংখ্যা,, ১৩২১) ইত্যাদি নিবন্ধে। বাংলা ব্যাকরণ সম্বন্ধে প্রবন্ধ সে-যুগে পণ্ডিতমহলে বিশেষ সাড়া সৃষ্টি করেছিল। তাঁর ঝোঁক ছিল চলতি ভাষার দিকে; বিশেষত তিনি বিষয়ীলোকের ভাষা এবং কথকতার বর্ণনাভঙ্গি অনুসরণ করার পক্ষপাতী ছিলেন।

সাহিত্য সম্মিলনের সম্বোধনে হরপ্রসাদ বাংলাভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের সম্পর্ক কিরূপ তা বর্ণনা করতে গিয়ে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের মত উল্লেখ করেছেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের মতে সংস্কৃত বাংলা ভাষার ঠান্দি। হরপ্রসাদ সংস্কৃতকে বাংলা ভাষার অতিবৃদ্ধ-প্রতিপতামহী আখ্যা দিয়ে পাণিনির সমকালীন সংস্কৃত ভাষা, অশোকের শিলালিপির ভাষা, সাতকর্ণিদের শিলা-লেখের ভাষা, পালি, মাগধী প্রাকৃত ইত্যাদি ভাষার পরিবর্তমান স্তরগুলো উল্লেখ করেছেন। অতএব, তাঁর মতে, সংস্কৃতের কাছে বাংলার ঋণ অতি সামান্য।

আপামর-জনসাধারণের ভাষার মধ্য দিয়ে অসংখ্য আরবি, ফারসি শব্দ বাংলা ভাষার সম্পদে পরিণত হয়েছে। কিন্তু রক্ষণশীল পণ্ডিতি বাংলার লেখকেরা 'দোয়াত' ও 'পাট্টা' শব্দের জায়গায় 'মস্যাধার" ও 'ভোগবিধায়েক পত্র" লেখার পক্ষপাতী। আবার ইংরেজী-ছাঁদে বাংলা যাঁরা লেখেন তাঁরা পণ্ডিতি বাংলা কিংবা আরবি, ফারসি শব্দ ব্যবহার না করে ইংরেজি বাক্যরীতি অনুসরণ করেন।

মুসলমানেরা বাংলায় সাহিত্য রচনা করে চলতি মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করেছেন; সুতরাং মুসলমানী শব্দ বর্জন করা অসম্ভব। বাংলা ভাষার বিশেষত্ব সম্বন্ধে বাঙালি মুসলমান তাঁদের চিন্তাভাবনা প্রকাশ করেছেন। তাঁর অভিমত, সঙ্গত কারণে হিন্দুদের ভাষারীতি সর্বজনগ্রাহ্য হবে, এমন কথা বলা যায় না।

'মুসলমানী বাংলা' [''শুর্জ্জু উজাল বিবির কেচ্ছা''] ('বিভা', ফাল্গুন, ১২৯৪) হরপ্রসাদের মতে বাংলা ভাষার স্বতন্ত্র কোন ভাগ নয়; বাংলা ভাষার 'অবান্তর' একটি অংশ মাত্র। এই ভাষায় রচিত গল্প-কাহিনীগুলো আরবি ও ফারসি ভাষায় ভরপুর এবং পীর-ফকিরের সঙ্গে হিন্দু দেবদেবীও এসব কাহিনীতে স্থান পেয়েছে। বাংলা ভাষা সাহিত্যের ইতিহাসে 'মুসলমানী বাংলা'র যে একটি স্থান রয়েছে, একথা সে যুগে সর্বপ্রথম হরপ্রসাদই উপলব্ধি করেছিলেন। ''বাংলা ব্যাকরণ'' ('সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', প্রথম সংখ্যা, ১৩০৮) ও রাজশেখর বসুর' চলন্তিকা' প্রথম সংস্করণের (১৯৩০) সমালোচনা ''অভিধান'' ('প্রবাসী' আশ্বিন, ১৩৩৭) নামক রচনায় বাংলা ব্যাকরণ সম্বন্ধে হরপ্রসাদের নিজস্ব চিন্তা, যুক্তি ও প্রস্তাবসমূহ প্রকাশিত হয়েছে।

আলোচনার প্রারম্ভে বাংলা ভাষায় রচিত প্রায় দুই শতাধিক ব্যাকরণের উল্লেখ করে রচয়িতাদের সংস্কৃত ব্যাকরণ-অনুসারী ও ইংরেজি ব্যাকরণ-অনুসারী এই দুটি ভাগে তিনি ভাগ করেছেন। সংস্কৃত-অনুসারীদের রচনায় সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম-অনুযায়ী প্রথমেই বিভক্তির আলোচনা এবং ইংরেজি গ্রামার-অনুসারীদের রচনার শুরুতে পদ প্রকরণ বা Parts of Speech —এর আলোচনা দেখা যায়। হরপ্রসাদের মতে, বাংলা ভাষা যে পালি, মাগধী, অর্ধমাগধী, সংস্কৃত, পারসি, ইংরেজি ইত্যাদি ভাষার সংমিশ্রণে একটি স্বতন্ত্র ভাষার বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে ব্যাকরণ-রচয়িতারা সে সম্পর্কে অবহিত নন।

সংস্কৃতে কারকের লক্ষণ ক্রিয়ার সঙ্গে অন্বয়ে প্রকাশিত; অন্যদিকে, ইংরেজি Case বিশেষ্যের অবস্থান নির্দেশ করে। সুতরাং কারক ও Case-এর মধ্যে প্রভেদ অনেকখানি। করণকারকে 'দ্বারা', 'দিয়া' শব্দগুচ্ছ যে বিভক্তিরূপে ব্যবহৃত হয় তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কারণ শব্দের সঙ্গে জমাট না বাঁধলে তা বিভক্তি হয় না। বিভক্তি প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ আরো বলেন, ''যখন 'আমারদিগরকে' ব্যবহার করিত, তখন 'দিগর' বিভক্তি ছিল না। 'দিগর' পারস্য শব্দ গণ।''[১৫]

বাংলা ব্যাকরণের প্রথমেই সন্ধির আলোচনা এবং সম্প্রদান কারক এই এই দুই বিষয় বাংলা ব্যাকরণের জন্য হরপ্রসাদ অনাবশ্যক মনে করেছেন। তাঁর যুক্তিও এই যে, তৎসম বা তদ্ভব শব্দের উৎপত্তি জানবার জন্য যদি 'অতএব', ইতস্ততঃ' ইত্যাদি শব্দের সন্ধি দিতে হয়, তাহলে বাংলায় ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দের জন্যও সন্ধির সূত্র রাখা প্রয়োজন। তাঁর মতে যে সব শব্দ কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন হয়ে বাংলায় এসেছে তাতেই শুধু সন্ধি আছে, খাঁটি বাংলায় নাই।

বাংলায় সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের আধিক্য প্রসঙ্গে পুনরায় তিনি বিদ্যাসাগরের সমালোচনা করেছেন এ ভাবে, "লিখিত ভাষায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুকরণে সংস্কৃতের বাড়াবাড়ি কিছু বেশি হইয়াছিল বটে, কিন্তু ক্রমে সে ভাষা অপ্রচলিত হইয়া আসিতেছে।"[১৬] তাঁর মতে বাংলায় তিন-চারটির বেশি বিভক্তি নেই ; বিভক্তি মূলত শব্দের অঙ্গ এবং কারক অর্থের অঙ্গ। সুতরাং বিভক্তি ও কারক স্বতন্ত্রভাবেই দেখানো উচিত। 'আহার করা', 'প্রচার করা' ইত্যাদিতে বিশেষ্য ও ক্রিয়ার সংমিশ্রণ লক্ষ্য করে ব্যাকরণকারেরা যে 'মিশ্র ক্রিয়া' নির্দেশ করেছেন তাকে "অদ্ভুত আবিষ্কার" বলে অভিহিত করেছেন হরপ্রাসাদ।

সবশেষে তিন দেখিয়েছেন যে, সংস্কৃত 'ব্যাকরণ' শব্দ ব্যবহার করে ইংরেজি গ্রামারের লক্ষণ দিয়ে বাংলা ব্যাকরণের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়েছে তাতে বিসমিল্লায় গলদ রয়ে গেছে। তাঁর মতে "সংস্কৃত ব্যাকরণ" শব্দের অর্থ "'ব্যাক্রিয়ন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে শব্দাঅনেনে" অর্থাৎ "ইটিমলজি-ডেরিভেশন।"[১৭] প্রবন্ধের উপসংহারে হরপ্রসাদ ইংরেজি-গ্রামার ও সংস্কৃত—ব্যাকরণের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করে প্রশ্ন রেখেছেন :

> ইংরেজি গ্রামার কিন্তু সচরাচর পাঁচ ভাগে বিভক্ত—অর্থোগ্রাফি, ইটিমলজি, সিনট্যাক্স, পংচুয়েশন এবং প্রসডি, সময়ে সময়ে উহাতে figures of speech এবং compositionও থাকে : সংস্কৃতে কিন্তু orthography-র জন্য শিক্ষা নামে শাস্ত্র, ··· figures of speech এর জন্য অলঙ্কারশাস্ত্র আছে ; punctuation ও composition এর জন্য সংস্কৃতে স্বতন্ত্র শাস্ত্র নাই। ব্যাকরণ শুদ্ধ etymology মাত্র; সেই ব্যাকরণকে grammar এর লক্ষণে লক্ষিত করা উচিত কিনা, সহজেই বোধ করা যাইতে পারে।[১৮]

হরপ্রসাদের ভাষা-চিন্তায় যেমন নতুন ধারণা ও প্রস্তাবের কথা এসেছে ব্যাকরণ ও অভিধানের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয় নি। ব্যাকরণবিদ না হয়েও বাংলাভাষার রূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল অনন্যসাধারণ, দৃষ্টি ছিল পরিচ্ছন্ন ও বৈজ্ঞানিক। হরপ্রসাদ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও বাংলাভাষার প্রকৃতি যে সংস্কৃতভাষা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, তা খুব সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন। ভাষাবিষয়ক রচনায় এবং ব্যাকরণ ও অভিধান-বিষয়ক বক্তব্যে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বাংলাভাষার স্বাতন্ত্র্যের কথা বলেছেন। পণ্ডিতি বাংলার প্রভাব কাটিয়ে বাংলাভাষা নিজ শক্তিতে যখন চলতে শুরু করেছে তখন হরপ্রসাদ এই ভাষার গতি-প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করে ব্যাকরণ রচনার প্রস্তাব করেছেন। হরপ্রসাদের আগে রামমোহন রায় বাংলা ব্যাকরণে কিছু কিছু পরিবর্তনের প্রস্তাব করেছিলেন। সম্প্রদান কারকের কারকত্ব রামমোহন রায় স্বীকার করেন নি। রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন।[১৯] সুকুমার সেনও সম্প্রদান কারককে 'গৌণকর্ম' হিসেবে নির্দেশ করেছেন।[২০]

হরপ্রসাদ বাংলা ব্যাকরণের ত্রুটি নির্দেশ করে যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাতে সাড়া দিয়ে 'বাংলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধের বিপক্ষে ও পক্ষে আলোচনা করেছিলেন বীরেশ্বর পাঁড়ে, চারুচন্দ্র ঘোষ, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, হীরেন্দ্র-হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যোগীন্দ্রনাথবসু, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এঁদের মধ্যে বীরেশ্বর পাঁড়ে হরপ্রসাদের প্রস্তাবের বিপক্ষে মন্তব্য করেছেন। অন্য সকলেই হরপ্রসাদের প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছেন।[২১]

হরপ্রসাদের এই রচনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য পরিষদের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে (১২ আশ্বিন, ১৩০৮ / ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯০১) "বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত" এবং সপ্তম মাসিক অধিবেশনে (২৪ অগ্রহায়ণ ১৩০৮ / ৯০ ডিসেম্বর ১৯০১) "বাংলা ব্যাকরণ" নামে প্রবন্ধ দুটি পড়েন। উভয় সভাতে উপস্থিত থেকে হরপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ দুটি সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই প্রসঙ্গে সুকুমার সেনের মন্তব্য লক্ষ্যণীয়,

> শাস্ত্রী মহাশয় প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণের যে দোষ দেখিয়েছিলেন তা আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কোন বিদ্বান মনীষী সংশোধনের অথবা

প্রতিকারের জন্য কলম ধরেন নি। এমন কি সুনীতিবাবুও তা এড়িয়ে গেছেন তাঁর বিরাট 'ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ'— এ।

····এ আলোচনায় তিনি (রবীন্দ্রনাথ) প্রবৃত্ত হয়ে ছিলেন শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠ শুনে তার পরেই। তাই মনে করি রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নির্দেশ অনুধাবন করে বিচারের পথে পা বাড়িয়ে ছিলেন।[২২]

"নূতন কথা গড়া' বা নতুন শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইংরেজি বা সংস্কৃত শব্দ পরিহার করে চলিত বাংলা শব্দের সাহায্যে যথাযথ ভাব প্রকাশ করা সম্ভব বলে হরপ্রসাদ মনে করতেন। তাঁর মতে সংস্কৃত 'ভঙ্গপ্রবণ', বা 'ভঙ্গুর' শব্দের স্থানে 'ঠুনকো', 'উপত্যকা' শব্দের বদলে হিন্দি 'দুন' 'শব্দের অর্থদ্যোতকতা কোন অংশে কম নয়। observatory 'র অর্থ', 'পর্যবেক্ষণিকা'র মত কঠিন সংস্কৃত শব্দের বদলে হিন্দি নাম 'মানমন্দির' বা 'তারা-ঘর' সংশ্লিষ্ট বিষয়ের একেবারে কাছাকাছি। বাংলা ভাষার সত্তা, জীবন, উৎপত্তি, স্থিতি, সবই সংস্কৃত ভাষা থেকে স্বতন্ত্র। হরপ্রসাদের মতে, মুসলমান শাসনের সাত শত বছরে আরবি, ফারসি ভাষার যে-সব শব্দাবলী বাংলার আবালবৃদ্ধ বনিতার মুখের ভাষায় নিত্য ব্যবহৃত হচ্ছে সেই ভাষা কোন মতে বর্জন করা উচিত নয়। বর্জন করলে ভাষার সচল, সচ্ছন্দ গতি রুদ্ধ হবে। রক্ষণশীল লেখকগণ সচেতনভাবে নালিশ', 'রফা', 'পাট্টা—কবুলতি' ইত্যাদি শব্দের স্থানে 'অভিযোগ,' 'মীমাংসা', 'ভোগ-বিধায়কপত্র' ইত্যাদি শব্দব্যবহার করে ভাষাকে অহেতুক সংস্কৃত ভারাক্রান্ত করার পক্ষপাতী। এই ধরনের উদ্যোগে সংস্কৃত শব্দের ভুল প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়। ইংরেজি 'নবেল' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ 'নবন্যাস' এমনই প্রমাদযুক্ত একটি শব্দ। 'নবন্যাস' বলতে নতুন গচ্ছিত ধন বোঝায়।

পরিভাষা-নির্মাণের ক্ষেত্রে হরপ্রসাদের যুক্তি হল চলতি বাংলা, হিন্দি, অসমীয়া ও ওড়িয়া থেকে সুচিন্তিতভাবে শব্দ আহরণ করে পরিভাষা নির্মাণ করা সম্ভব। লেখকদের উদ্দেশে তাঁর নির্দেশ, কেউ যেন ইংরেজিতে কল্পনা করে বাংলায় কিছু না লেখেন; তা যদি হয় তবে বাংলা ভাষা ইংরেজি—বাংলার উদ্ভট শৈলী থেকে মুক্ত হবে না।

"অভিধান" প্রবন্ধটি মূলত পুস্তক-সমালোচনা। শব্দ-শাস্ত্রের আভিধানিক সংগ্রহের ইতিহাস বর্ণনা-প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ সংস্কৃত অভিধানের তিনটি বিশেষ

জিনিসের— পর্যায়, নানার্থ ও লিঙ্গের—উল্লেখ করেছেন। হরপ্রসাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে 'চলন্তিকা' অভিধানে বানান সংক্রান্ত যেসব অনিয়মের উল্লেখ আছে তা প্রায় এক হাজার বছর আগে পুরুষোত্তম তাঁর বানানের বইয়ে উল্লেখ করেছেন।

ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের পর থেকে বিভিন্ন সময়ে সংকলিত অভিধানের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে টমাস কোলব্রুকের (১৭৬৫-১৮৩৭) ছাপান অমরকোষের অভিধান, লীডনের বর্ণানুক্রমিক অভিধান, রামকমল সেনের (১৭৮৩-১৮৪৪) চলিত ও অচলিত শব্দের অভিধান, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'শব্দসার' (১৮৬০), স্কুল বুক সোসাইটির বাংলা অভিধান, বটতলা থেকে প্রকাশিত 'শব্দার্থ-প্রকাশিকা', বিদ্যাসাগরের অসমাপ্ত বাংলা অভিধানের কথা বলে সর্বাধিক চলিত রামকমল বিদ্যালঙ্কারের 'প্রকৃতিবাদ অভিধান', সুবলচন্দ্র মিত্রের 'সরল বাংলা অভিধান', যোগেশচন্দ্র রায়ের 'বাংলা শব্দকোষ' ও জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাসের 'বাংলা ভাষার অভিধানে'র কথা বলেছেন। অভিধানের ইতিহাস বর্ণনা করে হরপ্রসাদ রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা' অভিধানকে বাংলা ভাষার প্রকৃত অভিধান বলে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

'চলন্তিকা'র বর্ণানুক্রমে দীর্ঘ 'ৠ', হ্রস্ব 'ঌ', দীর্ঘ 'ৡ' অক্ষর তিনটি বাদ দেওয়ায় তাঁর আপত্তি নেই; কিন্তু অন্তঃস্থ 'ব' বাদ দেওয়ায় তাঁর আপত্তি আছে। তাঁর মতে বেদ, বৈদ্য, বিবিধ ইত্যাদি শব্দে 'ব' এর উচ্চারণ ইংরেজি 'বি'-এর মতো হয় না। চলন্তিকার বর্ণানুক্রমে আদিতে 'ড়', 'ঢ়' বর্ণের অন্তর্ভুক্তি হরপ্রসাদ অযৌক্তিক মনে করেছেন। কারণ, কোন শব্দ 'ড়', 'ঢ়' বর্ণ দিয়ে শুরু হয় না। সংস্কৃত শব্দের বানান সর্বত্র সুনির্দিষ্ট একথা অস্বীকার করে তিনি দেখিয়েছেন যে সংস্কৃত বানানেও রকমফের আছে। যেমন বশিষ্ঠ, বসিষ্ঠ, কোশল, কোসল ইত্যাদি।

এখানেও হরপ্রসাদ Parts of Speech সম্বন্ধে পাণিনির মতো সুবন্ত ও তিঙন্ত শব্দের কথা বলেছেন। বিভক্তিযুক্ত না হলে কোন শব্দ ভাষায় প্রয়োগ হয় না; সুতরাং এমন শব্দ নেই, যার উত্তর বিভক্তি বসেনি। পাণিনির মতে যেসব শব্দে বিভক্তি নেই, তার বিভক্তি লোপ পেয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে অব্যয়, উপসর্গ, কর্ম প্রবচনীয়, কারক ইত্যাদিও আলোচনা করেছেন। 'চলন্তিকা' অভিধানে বানানের সুবিধার্থে বাংলার সমস্ত ধাতু-

রাশিকে ত্রিশ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই নতুন ব্যবস্থাকে হরপ্রসাদ স্বাগত জানিয়েছেন। পারিভাষিক শব্দের বেলায় তর্জমার চেয়ে মূল শব্দ ব্যবহারের পক্ষেই তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন। 'বাংলা ভাষা' প্রবন্ধেও সংস্কৃতজ্ঞ ও ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালির বাংলা ভাষা সম্বন্ধে তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন,

> ···যাঁহারা এ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় লেখনী ধারণা করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই বাংলা ভাষা ভালো করিয়া শিক্ষা করেন নাই। হয় ইংরেজি পড়িয়াছেন, না-হয় সংস্কৃত পড়িয়াছেন, পড়িয়াই অনুবাদ করিয়াছেন।[২৩]

হরপ্রসাদের পক্ষপাত দেশজ রীতির প্রতি; কবিকঙ্কন, ভারতচন্দ্র, রাম-প্রসাদ প্রমুখ কবি বিশুদ্ধ বাংলায় কাব্য রচনা করেছেন। তা গদ্যের ভাষা না হলেও প্রচলিত অর্থে ভদ্রসমাজের ভাষা। স্পষ্ট করে না বলেও তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে অপেক্ষাকৃত বেশি সংখ্যক মানুষের ভাষা একটি নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে এগোচ্ছিল।

তিন শ্রেণীর লোকের ভাষার মধ্যে বিষয়ীলোকের ভাষাকে হরপ্রসাদ বিশুদ্ধ বাংলা বলেছেন। তাঁর মতে ইংরেজের হস্তক্ষেপের ফলেই এই ভাষার নিজস্ব গতি ব্যাহত হয়েছে।

তারশংকর তর্করত্নের 'কাদম্বরী'র কিছু অংশ উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন,

> এই শ্রেণীর লোকের হস্তে বাংলা ভাষার উন্নতির ভার অর্পিত হইল। ···বাংলা ভাষার পরিপুষ্টির দফা একেবারে রফা হইয়া গেল।[২৪]

অন্যদিকে, বিদ্যাসাগর সম্পর্কে সমালোচনাও বিশেষ যুক্তিগ্রাহ্য নয়; তাঁর অন্যান্য রচনার ভাষায় প্রাঞ্জল গদ্যের যে নিদর্শন রয়েছে হরপ্রসাদ তার উল্লেখ করেন নি। তবে লিখিত বাংলা ও কথিত বাংলার দুস্তর প্রভেদের জন্য সাধারণ সংখ্যা বাড়েনি এবং সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা দুর্বোধ্য ভাষার জন্যে বেশিদিন স্থায়ী হয়নি বলে তিনি যে অভিমত দিয়েছেন তা অমূলক নয়।

বস্তুত ভাষাচিন্তায় হরপ্রসাদ ছিলেন উদার, বৈজ্ঞানিক চিন্তার অধিকারী ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে চিন্তারত একজন মানুষ। দেশজ রীতির

ভাষাকে, সযত্ন ও সচেতন পরিচর্যায় সমৃদ্ধ করে সমাজের সর্বস্তরের সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠির মুখের ভাষায় পরিণত করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তাঁর নিজের রচনার ভাষা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে হরপ্রসাদের ভাষায় অন্যদের বিশেষ প্রভাব ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের আগে যিনি হরপ্রসাদের ভাষা চিন্তাকে প্রভাবিত করে ছিলেন তিনি হচ্ছেন সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৩৮— ?)। প্রাঞ্জল বাংলা লেখা কিভাবে শিখলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রশ্নের উত্তরে হরপ্রসাদ বলেছিলেন যে তিনি শ্যামাচরণ গাঙ্গুলির চেলা। বঙ্কিমচন্দ্রও জবাবে স্বীকার করেছিলেন যে, শ্যামাচরণ গাঙ্গুলির চেলা না হলে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রের পক্ষে এমন বাংলা লেখা অসম্ভব।[২৫] ১৮৬৭ থেকে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় সংস্কৃত কলেজে শিক্ষকতা করেছিলেন। Bengali Spoken and Written (1977) নামে প্রবন্ধ লিখে শ্যামাচরণ Sanskritised বাংলার সমালোচনা করেন। এই প্রবন্ধকে বঙ্কিমচন্দ্রও উৎকৃষ্ট বলে স্বাগত জানিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বাঙালা ভাষা' ('বঙ্গদর্শন', জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৫) প্রবন্ধের অনেকখানি জুড়ে শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের গুণ ও ত্রুটি বিচার করেছেন। হরপ্রসাদ বাংলা ভাষা নিয়ে যে প্রবন্ধ রচনা করেন তা এঁদের অনুপ্রাণনায় সম্ভব হয়েছিল। চার বছরের ব্যবধানে শ্যামাচরণ, বঙ্কিমচন্দ্র ও হরপ্রসাদের তিনটি রচনা বেরিয়েছিল। তাই বলা যায়, গদ্য রচনার শুরুতেই হরপ্রসাদ সচেতনভাবে অগ্রসর হবার কথা চিন্তা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এবং শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রভাব ছাড়াওতাঁর গদ্য শৈলীতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহজ কথোপকথনের ভঙ্গি লক্ষ করা যায়।[২৬] দ্বিজেন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের গদ্য কথ্যরীতি-ঘেঁষা। এই রীতির প্রভাব রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যদের উপরেও পড়েছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রবন্ধের ভাষা যদিও সংস্কৃতানুসারী সাধুভাষার কাঠামোতে রচিত। তবু এর মধ্যেও "বাক্য প্রয়োগে, সমাসবদ্ধ পদ রচনায়, পরিভাষা রচনায়, নতুন বাক্য গঠনে, তাঁর মৌলিকতা পদে পদে লক্ষ্য করা যায়।"[২৭] 'গীতাপাঠে'র মত গুরুগম্ভীর অধ্যাত্মবিষয়ক আলোচনায় সাহিত্যে ব্যবহার্য্য নয় এমন চলতি শব্দ তিনি অবলীলাক্রমে ব্যবহার করেছেন। যেমন, 'অমুকানন্দ স্বামী', 'গোড়াঘ্যাঁসা' 'সস্কিড়িমিড়ি' 'গিটকিরিবাজী' 'আঁকুবাঁকু', সাঁটেসেঁটে', দু-দেঁড়ে', 'বুলিবোলনেওয়ালা', ইত্যাদি। এ-রকম শব্দ হরপ্রসাদের ভাষায় অসংখ্য-বার ব্যবহৃত হয়েছে। তিনিও প্রবন্ধের সাধুভাষার কাঠামোয় ক্রিয়াপদের

চলিত রূপ ব্যবহার করেছেন। 'জিঁয়াচ পোয়াতি', 'পাপোঁর ফুলুরির গাদি', 'সাঁকারির করাত', আঁকের কলম', নেবু', নাদবুড়ো গন্ধ', 'দোবজাকাঁঠ' 'ঝিঁক্কুড়' ইত্যাদি মুখের ভাষার শব্দ তাঁর রচনাকে সর্বজনগ্রাহ্য করেছে।

হরপ্রসাদের স্বকীয় শৈলীতে কিভাবে উত্তরণ ঘটেছিল তার নমুনা হিসেবে তাঁর রচনার উদ্ধৃতিদান বাঞ্ছনীয়। "ভারতমহিলার" মালবিকা চরিত্রের ব্যাখ্যা,

> তিনি রাজার সংসারে থাকেন এবং নৃত্যগীত শিক্ষা করেন। তৎকালে লোক অত্যন্ত বিলাসপ্রিয় ছিল। কিন্তু বিলাসপ্রিয় রাজা বা রাজ-কর্মচারীকে প্রীত করিতে হইলে যে সকল শিক্ষা আবশ্যক, তিনি তাহাতেই নিপুণা। পরে রাজার প্রণয়িনী হইলেন। কিন্তু তাহা তাঁহার অন্তরেই রহিল। রাজাও যে তাঁহার প্রতি আসক্ত তাহা তিনি জানেন না। কিছুদিন পরে গান্ধর্ব্ববিধানে উভয়ের বিবাহ হইল।[২৮]

এখানে বর্ণনার সারল্য লক্ষ্যণীয়। এই রচনার সর্বত্র যে সারল্য রক্ষিত হয়েছে, এমন নয়। নিমিত্তাধীন মাত্র', 'সংসারকার্যচাতুর্য্য', গর্ব্বহেতভূভূতা', 'পাদসংবাহনা', 'হরিদ্রাকুঙ্কুমসিন্দুরাদি', 'গৃহমার্জ্জনতৎপরা', 'বিলোলুপা', 'অমুক্তহস্ততা', 'সুগুপ্তভাণ্ডতা', 'মঙ্গলাচারতৎপরতা' জাতীয় সমাসবদ্ধ সংস্কৃত শব্দের বিস্তর ব্যবহার আছে। তবু তার মধ্যে মুখের ভাষার ব্যবহার অপ্রতুল নয়; যেমন,

> পতিসেবা ঋষিদিগের ব্যবস্থা, পুরাণ তাহার বিশেষ করিতে গিয়া, যে কত আগ্‌ড়ম বাগ্‌ড়ম লিখিয়াছেন, তাহা বলিয়া উঠা যায় না।[২৯]

'বাল্মীকির জয়ে'র আরম্ভ চমৎকার ছোট ছোট বাক্যে,

> বর্ষা শেষ হইয়াছে। শরৎ উপস্থিত। আকাশ পরিষ্কার, মেঘের লেশমাত্রও নাই। নীল-সুনীল-গাঢ়নীল-বর্ণনার অতীত মনোমোহন নীল রঙের ছটার মাঝে বড়ো বড়ো তারা জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছে।[৩০]

আগাগোড়া ভাষার সরলতার সঙ্গে ভাবের মিলন ঘটেছে। তবে সর্বত্র ভাষা এমন সহজ নয়, অনেকক্ষেত্রে গুরুগম্ভীর, সংস্কৃত বিশেষণ শোভিত।

'ভারতমহিলা'র মত সংস্কৃত সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার প্রচুর। পর পর সাজানো বর্ণনাত্মক ভঙ্গির বাক্যবিন্যাস 'বাল্মীকির জয়ে' বেশি পরিমাণে লক্ষ্যণীয়। গুরু-গম্ভীর বাক্যের নমুনা,

> প্রথম সাক্ষাতে বন্দনাদির পর বশিষ্ঠদেব উদাত্ত অনুদাত্তস্বরিতাদি স্বরপ্রক্রিয়া পরিশোধিত কোমল মসৃণ অথচ গম্ভীর স্বরলহরীতে গিরিগুহাকন্দরাদি প্রতিধ্বনিত করিয়া বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজাধিরাজ, বহু দিবসাবধি আমি শ্রুত আছি আপনি ভূবন বিজয় ব্যাপারে লিপ্ত আছেন। তপঃস্বাধ্যায়াদি আনুশ্রবিক ক্রিয়া-কলাপে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকাতে ভবাদৃশ বীরজনের অদ্ভূত চরিত্র-সম্বন্ধীয় সংবাদও লইতে পারি নাই।[৩১]

> "ভারতমহিলা" প্রবন্ধ আর 'বাল্মীকির জয়' পুরাণাশ্রিত রম্যরচনা।

বিষয়গত কারণেই উপন্যাসের ভাষা এই দুইয়ের ভাষা থেকে কিছুটা পৃথক। "কাঞ্চনমালা'র আরম্ভে কুণাল ও কাঞ্চনমালার প্রণয়দৃশ্যের ভাষা উনিশ শতকের ঐতিহ্যানুসারী আবেগময়, কাব্যগন্ধী বর্ণনায় ভরপুর,

> দুইটি ফুল, সমান ফুটিয়াছে, সমান হাসিতেছে, গন্ধে চারিদিক আমোদ করিতেছে।···সমবিকশিত, সমপ্রস্ফুটিত, সমগন্ধামোদিত, সমান কুসুমদ্বয়ের মিলন কেমন সুন্দর।[৩২]

বঙ্কিমচন্দ্রের ভঙ্গিতেই প্রশ্ন করেছেন,

> এমন মিল কেহ কোথাও দেখিয়াছ কি? হৃদয়ে হৃদয়ে প্রেমডোরে বাঁধা দেখিয়াছ কি? নয়নের আড় হইলে হৃদয়তন্ত্রী ছিঁড়িয়া যায় দেখিয়াছ কি?[৩৩]

আবার, বঙ্কিমচন্দ্রের অনুকরণেই তিষ্যরক্ষার মনে সুমতি ও কুমতির দ্বন্দ্ব এঁকেছেন দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। সুমতি ও কুমতির কথোপকথন অংশের ভাষা প্রাঞ্জল ও সরস। অথচ তৃতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম অনুচ্ছেদে প্রায় বাণভট্টের "কাদম্বরী'র অনুরূপ ভাষা ব্যবহার করেছেন। এই অংশটি বাদ দিলে 'কাঞ্চনমালা'র ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব সত্ত্বেও হরপ্রসাদের নিজস্ব শৈলীর পরিচায়ক।

সরস সৃজনশীল রচনায় ভাষা বিষয়ের অনুগামী হয়েছে। "প্রকৃত প্রণয় ও বিবাহ" নিবন্ধে স্ত্রীলোকের ভালবাসা হরপ্রসাদের ভাষায় 'একপ্রকার কল মাত্র'। "এক রকম কি গোলমালযুক্ত একটা মানসিক ভাবের" মধ্যে বাস করে তারা জীবন কাটিয়ে দেয়। "ভালবাসার কল" এবং "গোলমাল যুক্ত মানসিক ভাব" অত্যন্ত সাদামাটা ভাষা। দাম্পত্য-জীবনে নারীর বাধ্যতামূলক ভালবাসাকে আর কোনভাবেই বোধ হয় বিশ্লেষণ করা সম্ভব ছিল না। সত্যকথাটি বলার জন্য এমন ভাষারই প্রয়োজন ছিল। "তৈল" প্রবন্ধের ভাষায় শ্লেষের সঙ্গে সরসতাও আছে। সহজ, সাধারণ ভাষাভঙ্গির সাহায্যে মানবচরিত্রের বিশেষ দিক এতে উন্মোচিত হয়েছে নিপুণভাবে। যেমন,

> বাস্তবিকই তৈল সর্বশক্তিমান, যাহা বলের অসাধ্য, যাহা বিদ্যার অসাধ্য, যাহা ধনের অসাধ্য, যাহা কৌশলের অসাধ্য, তাহা কেবল একমাত্র তৈলদ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে। ••কিন্তু তৈল না থাকিলে তাহার বুদ্ধি থাকুক, হাজার বিদ্যা থাকুক, হাজার ধন থাকুক, কেহই টের পায় না।[৩৪]

শিক্ষা ও অর্থনীতি বিষয়ক প্রবন্ধের ভাষায় গাম্ভীর্য আছে, কিন্তু জটিল বাক্য বিন্যাসও সংস্কৃতবহুল শব্দের ব্যবহার কম। কিছু তৎসম শব্দের সঙ্গে মুখের ভাষার ফারসি ও ইংরেজি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, "আমাদের প্রাচীন কালে বৈদ্য বলিয়া স্বতন্ত্র জাতি ছিলনা, কি স্বতন্ত্র প্রোফেশন ছিল না"।[৩৫] আবার,

> সংগ্রহ গ্রন্থকার সর্বজ্ঞ হইলেন, তাঁহার গ্রন্থের উপর সরু কাটা আরম্ভ হইল, ফাঁকি আরম্ভ হইল। বিষয়ে বিদ্যার গৌরব রহিল না, গ্রন্থে বিদ্যার গৌরব হইল। পাঠ লাগানই বাহাদুরী হইয়া দাঁড়াইল।[৩৬]

শিক্ষাবিষয়ক আর একটি রচনার ভাষা আরো চমৎকার। হরপ্রসাদ সহজেই ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং বাংলায় তর্জমা করে তার অর্থান্তর ঘটান নি; যেমন তাঁর মতে,

> আজিকালি মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য আর মনুষ্যত্ব নাই। আজিকালি লোকে কেবল "সাইন" করিতে চেষ্টা করে। পৃথিবীতে যতপ্রকার স্বার্থপরতা আছে, বোধ হয়, তাহাদিগের শেষ সীমা "সাইন" করা।[৩৭]

সংস্কৃত সাহিত্যালোচনায় ইংরেজি ও ফারসি শব্দ একই সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। যেমন,

> এখন রিহার্সাল; রিহার্সালে লক্ষ্মী সাজিয়া উর্ব্বশী যেখানে নারায়ণের নাম করিতে হইবে, সেখানে পুরুরবার নাম করিয়া বসিলেন। ভারতমুনি বড় বদরাগী ও বদমেজাজী।[৩৮]

> শুনিলাম নাকি যিনি অশ্লীলতার উকীল সরকার, পবলিক প্রসিকিউ-টার, যিনি লোকের অশ্লীলতা লইয়া অনেকবার নালিসবন্দ হইয়াছেন, তাঁহারই প্রস্তাবে ঐ সর্গ পাঠ্য নির্দিষ্ট হইয়াছে।[৩৯]

> চাকর—চাকরাণী, খানসামা, খিদমতগার কিছুরই দরকার নাই।[৪০]

বাংলা সাহিত্য আলোচনায়ও দেখা যায়, 'general reader', 'popularity', 'moral tone'[৪১] ইত্যাদি শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন অনায়াসে। সাধারণ লোক প্রচলিত শব্দ '''বিসমোল্লায় (বিসমিল্লায়) গলদ' শব্দের ব্যবহারে তাঁর ভাষাচিন্তার উদার ভঙ্গি লক্ষ্যণীয়।

শব্দ ব্যবহারের উদারতা ছাড়াও তাঁর গদ্যশৈলীর বিশিষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে দ্বিত্ব ও ধ্বনাত্মক শব্দের প্রয়োগে, বাক্যের হ্রস্ব-দীর্ঘতায়; শ্লেষ, উৎপেক্ষা, স্তূপীকৃত বিশ্লেষণ অনুপ্রাস; উপমা, একই শব্দের পুনরাবৃত্তি ও ক্রিয়াপদ ব্যবহারের নিজস্ব ভঙ্গি ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন কৌশলে।

(ক) দ্বিত্ব শব্দের প্রয়োগ

> 'কুহু কুহু রব', 'কচি কচি পাতা', 'বিন্দু বিন্দু ঘাম'।[৪৩]

(খ) ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার

> ফলাগুলা খুব সানানো, চক্‌চক্ করিতেছে, তাহার উপর আবার সূর্যের কিরণ পড়িয়া ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। দূরে গাছের মাথায় তাহার ছায়া যেন জ্বলিতেছে।[৪৪]

> শুকনা পাতাগুলি সড় সড় করিয়া শব্দ করিতেছে।[৪৫]

(গ) বাক্যের হ্রস্ব ও দীর্ঘতা

> শকুন্তলার মা মেনকা। স্বর্গের অপ্সরা অপ্সরাদের সেরা। ইন্দ্রের আজ্ঞাকারী।[৪৬]

পৃথিবীর মধ্যে সকলের চেয়ে যে সুন্দর জায়গা, কালিদাস রাজাকে আর উর্ব্বশীকে সেইখানে লইয়া গিয়াছেন। দুটিতে এক হইয়া থাকিলেও পরস্পরের সৌন্দর্য্যে দুজনেই ডুবিয়া থাকে, তাই কিছু কালের জন্য একটিকে সরাইয়া আর একটীকে দিয়া সেই সৌন্দর্য্য টুকু প্রকাশ করিয়া ছিলেন।[৪৭]

(ঘ) শ্লেষ

অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক দুর্ব্বাসার শাপেই উজ্জ্বল।[৪৮]

অনেক সময়ে রামের নাম উল্লেখ করিয়া দেখি শ্যামের নাম না করিয়া চলে না, আবার শ্যামের নাম করিয়া দেখি কৃষ্ণের নাম না করিলে চলে না।[৪৯]

(ঙ) উৎপ্রেক্ষা

মুসলমান অধিকাররূপ শিশিতে বা বোতলে হিন্দু ও বৌদ্ধ দুই জাতিকে বন্ধ রাখিয়া এই সাত শত বছরের পর দেখা যাইতেছে, দুই-ই এক হইয়া গিয়াছে, ইতর-বিশেষ করা যায় না।[৫০]

(চ) স্তূপীকৃত বিশেষণ

প্রসিদ্ধ তীক্ষ্ণবুদ্ধি নৈয়ায়িক[৫১]

চোখ ডাগর, উজ্জ্বল, পটলচেরা[৫২]

উহা অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অচ্ছিদ্র, দৃঢ়, সার, অদাহি, অবিনাশী—এই শূন্যতার নামই বজ্র।[৫৩]

অনন্ত, অসংখ্য, অর্ধবিবসনা তিষ্যরক্ষা[৫৪]

ঋদ্ধিমতী, পতিপরায়ণা ধর্মানুরাগিনী, রমণীকুলললামভূতা কামিনীকে—[৫৫]

(ছ) অনুকার শব্দের ব্যবহার

রাশি রাশি তরবারি, বড়ো বড়ো বাঁশ, সহস্র সহস্র সূত্রধর[৫৬]

(জ) একই শব্দের পুনরাবৃত্তি

শূন্য হইলাম, শূন্য বুঝিলাম, আমিও শূন্য বুঝিলাম; কিন্তু যখন বুঝিলাম, সে শূন্য মহাসুখময়—তখন শূন্যটাও যেন ভরা ভরা হইয়া উঠিল।[৫৭]

(ঝ) অনুপ্রাস

এক খণ্ড চৌকস চৌরস জমি পড়িয়া আছে।[৫৮]

(ঞ) উপমা

সেই ফোলা জলের মাথায় নৌকাগুলি মোচার খোলার মতো উঠিয়া পড়ে।[৫৯]

(ট) ক্রিয়াপদ ব্যবহারের সাধারণ প্রবণতা

অতীতকালের ক্রিয়ার পাশাপাশি বর্তমান কালের ক্রিয়াপদের ব্যবহার প্রায় সর্বত্র। যেমন,

> সমুদ্র দর্পণের মতো স্থির হইল; নৌকা জোরে চলিতে লাগিল, কিন্তু টলে না। মাঝির উপর তাহার বিশ্বাস বাড়িয়া গেল। ঝড় তখনো সামনে বহিতেছো বিহারী মাঝির ঘরে বসিয়া দেখিল, তাহার নৌকা স্থির সমুদ্রের উপর দিয়া বেগে উত্তর-পশ্চিমমুখে যাইতেছে। তাহার সব ডিঙাগুলি দূরে দূরে দেখা যাইতেছে।[৬০]

একই বাক্যে একই ক্রিয়াপদের পুনরাবৃত্তি :

> আমি অনহিল গিয়াছিলাম, শাকম্ভরী গিয়াছিলাম; ধারায় গিয়াছিলাম, ত্রিপুরী গিয়াছিলাম, খাজুরাহো গিয়াছিলাম, দিল্লী গিয়াছিলাম, কনৌজ গিয়াছিলাম, মাণ্ডোরা গিয়াছিলাম।[৬১]

(ঠ) নতুন শব্দ প্রয়োগ

'সুবিধা', 'কুবিধা'[৬২]

Syntex—বাদার্থ, etymology—ব্যাকরণ[৬৩]

transition period—পরিবর্তন সময়[৬৪]

এইসব বৈশিষ্ট্য ছাড়াও কোন কোন রচনার সাধুভাষার ক্রিয়াপদ তুলে দিলেই তা মুখের ভাষার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে। যেমন,

> ইংরাজীতে অঙ্ক কষিতে হইবে, ইতিহাস পড়িতে হইবে, বিজ্ঞান শিখিতে হইবে, ইহার অর্থ কি? বাঙালা দিয়া ইংরাজী শিখ না কেন? ইংরাজী দিয়া শাস্ত্র শিখিতে যাও কেন?[৬৫]

ভঙ্গিটি অবিকৃতভাবে মুখের ভাষার। এই ভঙ্গিই ব্যবহৃত হয়েছে "খাজানা কেন দিই" প্রবন্ধের গোড়ায়। যেমন,

> তোমার জমি হইল কিরূপে। তুমি বলিবে আমি কিনিয়াছি। কিন্তু জমী কার যে তুমি কিনিবে। তোমার জিনিস তুমি ইচ্ছামত নষ্ট করিতে পার, কিন্তু তোমার জমী তুমি নষ্ট করিতে পার না। বাস্তবিকও তুমি জমী কেন নাই, তুমি কিনিয়াছ জমী ব্যবহারের স্বত্ব।[৬৬]

প্রথম অনুচ্ছেদের ভাষা সম্বোধনসূচক বাক্য দিয়ে শুরু হলেও পরে বিষয়ের গুরুত্ব অনুযায়ী ভাষায় ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে। আগাগোড়া প্রবন্ধটি ভূমির উপর মানুষের স্বত্ব এবং খাজানা কেন দিতে হয় ইত্যাদি জটিল বিষয়ের আলোচনা সত্ত্বেও উপস্থাপনা ও ভাষার পারিপাট্যে পাঠকের হৃদয়-গ্রাহী। "বাংলা সাহিত্য বর্তমান শতাব্দীর" রচনাটি মূলত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। বিদ্যাসাগরের অবদান সংক্ষেপে বলতে গিয়ে বলছেন।

> ইনি একা একশত, ইনি যে বাঙালিকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছেন, বাংলায় শিক্ষা বিভাগ স্থাপন করিবার সময় যে গবর্ণমেণ্টকে কত বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন, তাহা সমস্ত খুলিয়া লিখিতে গেলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হয়। ইনি সর্বপ্রথম বাঙালিকে বিশুদ্ধ বাংলা শিখাইয়াছেন।[৬৭]

কথকঠাকুরের ভঙ্গিতেই এখানে তিনি বিদ্যাসাগরের কর্মধারার পরিচয় দিয়েছেন।

বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যের মত জটিল বিষয়ও আয়াসহীন, বর্ণনাত্মক ভাষার ক্ষমতায় উপভোগ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। প্রবন্ধগুলোর নামকরণের মধ্যে অত্যন্ত সাদামাটা অথচ চমৎকৃত করার মত একটি কৌশল বরাবর লক্ষ্যণীয়। যেমন "ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ", 'বৌদ্ধ কাহাকে বলে ও তাঁহার গুরুকে", "কোথা হইতে আসিল", "বৌদ্ধধর্ম কোথায় গেল", "এখনো একটু আছে", "দলাদলি", "হিন্দু বৌদ্ধে তফাত", ও "বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় বক্তৃতা করিতেন" জাতীয় শিরোনামা বিষয়ের আপাত-গম্ভীর গুরুত্ব হ্রাস করে পাঠকের মনকে কৌতূহলী করে তোলে সহজেই। "বৌদ্ধ কাহাকে বলে ও তাঁহার গুরুকে" প্রবন্ধের প্রথম কয়েকটি বাক্য এরকম :

> বৌদ্ধধর্ম যত লোকে মানে, এত লোকে আর—কোনো ধর্ম মানে না। চীনের প্রায় সমস্ত লোক বৌদ্ধ। জাপান, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া এবং সাইবেরিয়ার অধিকাংশ লোকই বৌদ্ধ। তিব্বতের সবলোক বৌদ্ধ। ভুটান, সিকিম, রাম পুরবুসায়রের সবলোক বৌদ্ধ। নেপালের অর্ধেকেরও বেশি বৌদ্ধ। বর্মা-সায়াম, ও আনাম অবচ্ছেদাধচ্ছেদে বৌদ্ধ। সিংহল দ্বীপে অধিকাংশ বৌদ্ধ।[৬৮]

'প্রজ্ঞাপারমিতা' গ্রন্থের নানা সংস্করণের বর্ণনা দিতে পরপর সাতবার 'সংস্করণ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। জটিল একটি বাক্য তৈরী না করে অনেকগুলো ছোট ছোট বাক্য ব্যবহারের ফলে বক্তব্য মনোহর হয়েছে। এই ধরনের ব্যাখ্যাধর্মী, বর্ণাত্মক ভাষারীতি প্রয়োগ করার পেছনে হরপ্রসাদের সচেতন অভিপ্রায় কার্যকর ছিল।

হীনযান ও মহাযানের সাধনার পার্থক্য বোঝাতেও হরপ্রসাদের ভঙ্গি একান্ত সাধারণ,

> হীনযান অর্হত্ব পাইলেই খুশি, মহাযান তাহাতে খুশি নয়—তাহারা বুদ্ধত্ব চায়। এ দুয়ে তফাত কী? অর্হৎ নির্বাণ পাইলেন, বুদ্ধও নির্বাণ পাইলেন। উভয়েই জন্মজরামরণের হাত হইতে উদ্ধার পাইলেন। উভয়েরই বোধিজ্ঞান লাভ হইল। তবে ইহাদের মধ্যে প্রভেদ কী?[৬৯]

হরপ্রসাদের প্রকাশভঙ্গি সম্পর্কে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মূল্যবান উক্তি লক্ষ্যণীয়:

> যতই গভীর বিষয় হউক না কেন, প্রকাশভঙ্গী এমনই স্বচ্ছ, সহজও সর্বজনবোধ্য হওয়া উচিত, যাহাতে বক্তব্য অনায়াসে যথাসম্ভব সকল শ্রেণীর পাঠকের কাছেই পৌঁছিতে পারে। শাস্ত্রী মহাশয়ের নিজের রচিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে এই প্রসাদগুণ ও প্রাঞ্জলতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।[৭০]

তাঁর এই সহজ প্রকাশভঙ্গি সংস্কৃত সাহিত্যালোচনায় ক্ষেত্রবিশেষে দুঃসাহসিক সংস্কার সাধন করেছে। "দুষ্মন্তের ভাঁড় মাধব্য" প্রবন্ধে মৃগয়াকালীন রাজার খাদ্যের বর্ণনা দিয়েছেন হরপ্রসাদ এভাবে,

> রাজা ত বনে বনে কেবল "ঐ হরিণ, ঐ শূয়োর, ঐ বাঘ" করিয়া জানোয়ারের পিছনে পিছনে ঘুড়িয়া বেড়ান, আর দুপুরবেলা পোড়া মাংস, শিক-কাবাব খান—সোঁতার জল খান,[৭১]

সংস্কৃত সাহিত্যকে দুর্বোধ্য ভাষার নিগড় থেকে বের করে সাধারণ রসজ্ঞ পাঠকের গ্রহণযোগ্য করার জন্য সহজ, আটপৌরে, কৌতূহলোদ্দীপক নামকরণ করেছেন। যেমন, "কালিদাসের মেয়ে দেখান", "বিরহে পাগল", "শকুন্তলায় হিঁদুয়ানী", "এক এক রাজার তিন তিন রাণী", "রঘুবংসের গাঁথুনি", "পার্বতীর প্রণয়", "রঘু আগে কি কুমার আগে" ইত্যাদি।

এই ভাবেই হরপ্রসাদের ভাষা রীতি অননুকরণীয় এক শৈলীতে রূপান্তরিত হয় "বেনের মেয়ে" উপন্যাসে। তারাপুকুরে মাছধরার বর্ণনা :

> জলের তলায় এত মাছ পড়িয়াছে যে, দুই নৌকার জেলেরাই জাল টানিয়া উঠাইতে পারিতেছে না। তখন জালের দড়ি নোল করিয়া দেওয়া হইল। কতকগুলি মাছ ঘাই দিয়া লাফাইয়া জালের পিছনে গিয়া পড়িল। তাহারা যখন লাফায়, তখন বোধ হইতে লাগিল যেন, রূপার মাছ বৃষ্টি হইতেছে। মাছগুলো রূপার মত সাদা, মাজা রূপার মতো চক্‌চকে, একটার পর আর একটা পড়িতেছে। চক্‌চকে রূপার রঙের উপর সূর্যের সোনালী রঙ পড়িয়া গিয়াছে। সে রঙের মেশামেশিতে এক অপূর্ব শোভা। জাল হালকা হইল, আবার জাল টানা আরম্ভ হইল।[৭২]

মাছধরার চিত্ররূপময় বর্ণনার পাশাপাশি গুরুপুত্রের গুণ ও বিষয়-আশয়ের বর্ণনা,

> একে তো গুরুপুত্রের রূপ আছে, গুণ আছে, বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, তপ আছে, জপ আছে, পূজা আছে, পাঠ আছে, শীল আছে, বিনয় আছে, কান্তি আছে, ধ্যান আছে, বীর্য আছে, প্রজ্ঞা আছে, স্মৃতিশক্তি আছে, বক্তৃতাশক্তি আছে, তাহার উপর তিনি বড়ো মানুষ, পঞ্চাশ খানি গ্রামের উপসত্ত্ব তিনি পান, তাহার উপর পূজা পার্বণে প্রণামী পান, পালি পার্বণেও যথেষ্ট আয় আছে।[৭৩]

উপন্যাসের শেষে গুণীজন-সংবর্ধনার সমাপ্তিতে গঙ্গাতীরের রাত্রিকালীন বর্ণনা,

> দেখিতে দেখিতে ফাল্গুণ মাসের পূর্ণিমার চাঁদ ভাসিতে ভাসিতে সভার মাথার উপর আসিয়া দাঁড়াইল। চাঁদের সে ঘন আলোয় সভাস্থল উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। চারিদিকে গঙ্গার জলের উপর যেন দুধ ঢালিয়া দিল। সভা ভঙ্গ হইল। শত শত কীর্তনিয়ার দল খোলে চাঁটি দিল।[৭৪]

এই ভাষাকে তাঁর ভাষা-আদর্শের মুখ্য প্রকাশ বলা যায়। কেননা,

> ইহাতে তৎসম, তদ্ভব ও খাঁটি দেশি শব্দ কেমন সুকৌশলে মিশ্রিত, খাপে-খাপে, খোপে-খোপে কেমন জোড়া লাগিয়া গিয়াছে। ইহার তুলনায় আলালী ভাষা গ্রাম্য, বীরবলী ভাষা কৃত্রিম। এ ভাষা শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই অনায়াসে বুঝিতে পারে।[৭৫]

এমন ভাষা-স্রষ্টা হয়েও হরপ্রসাদের গদ্য বাংলা গদ্যের নিয়মের ব্যতিক্রম এবং তাঁর অবস্থান বাংলা গদ্যসাহিত্যের একটি গলিতে।[৭৬] দেশজ রীতির বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়েছিল বলেই হরপ্রসাদর মত প্রতিভাধর গদ্যলেখকের স্থান হয়েছে অপ্রশস্ত পরিসরে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের গদ্যের বৈচিত্র্য ও তীক্ষ্ণতা হরপ্রসাদের রচনায় দুর্লভ। তার কারণ নিজের গদ্যকে বৈদগ্ধ্য-মার্জিত করে তোলার দিকে তাঁর খেয়াল ছিল না।

> রচনাশৈলীর ক্ষেত্রে দেশজ জীবন ও সংস্কৃতির প্রাণরসে পুষ্ট নিজের সত্তার গভীরতম নির্দেশে চালিত হয়েছেন বলেই শিক্ষিত জনজীবনের সম্পর্কবিহীন, পরগাছা মধ্যবিত্ত মানসের বিড়ম্বনায় তাঁকে আড়ষ্ট ও দ্বিধাগ্রস্ত হতে হয়নি। তাঁর গদ্যের সজীবস্রোতে লোক-ভাষার মিশ্রণ স্বাভাবিকভাবেই স্থান পেয়েছে।[৭৭]

রাজনীতি ও সংস্কারান্দোলন-নিরপেক্ষ অ্যাকাডেমিক জীবনচর্যার ঋজুতা রচনাশৈলীতেও লক্ষ্যণীয়। অথচ বাংলা-ভাষা, বাংলা-ব্যাকরণ ও পরি-ভাষা নির্মাণ বিষয়ে অনেকক্ষেত্রে যে বিচক্ষণতার পরিচয় তিনি দিয়েছেন তা তুলনারহিত।

> একটা সজাগ মন কান পেতে শুনেছিল সকল সামাজিকের বহতা কথাস্রোতের প্রাণময় কলধ্বনি। কেউ সেখানে অপাঙক্তেয় নয়—হিন্দুস্থানী গাড়োয়ান, ওড়িয়া, মৈথিলি, পাহাড়ি সবার কাছ থেকেই

> নেবার থাকতে পারে—ইংরেজি আর সংস্কৃতই শুধু দাতা নয়। ভাষা ব্যবহারে এই গণতান্ত্রিকতা বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ সুহৃদেরই প্রাপ্য।৭৮

প্রমথনাথ বিশীর মতে এই গদ্যশৈলী বাংলাগদ্যের রাজপথে স্থান করে নিতে পারে নি; তার কারণ দেশজরীতির ধারা উনিশ শতকের প্রারম্ভে নতুন উদ্যমের চাপে চাপা পড়ে গিয়েছিল।

অন্যদিকে হরপ্রসাদের ভাষারীতি সম্বন্ধে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য এই,

> তাঁর এই ভাষারীতি অতীব প্রশংসনীয় হলেও এর গোটাকতক অসুবিধে ও দুর্বলতা আছে। এ ভাষা বৈঠকী ধরনের, হালকা চালের, মজলিসী, আলাপচারী ভাষা—যদিও কাঠামোটি সাধুভাষার বটে। এ ভাষার মধ্যে শক্ত মেরুদণ্ডের কিছু অভাব আছে বলে এ চমক দেয়, প্রীতি আকর্ষণ করে, কিন্তু মনের গভীরে গিয়ে নানা বর্ণালী সৃষ্টি করতে পারে না। ···কিন্তু আমাদের দেশে গুরুতর ব্যাপারে ভাষাকেও গুরুগম্ভীর করার রীতি, হালকা ছাঁদের ভাষায় বিষয়ের গুরুত্ব যেন খানিকটা হ্রাস পায়, একথা অনেকেরই মনের কথা। তাই হরপ্রসাদের গদ্যরীতির অভিনবত্ব সম্বন্ধে অনেকেই উদাসীন কিন্তু কৃত্রিম সংস্কারের চশমা খুলে বিচার করলে তাঁর ভাষাকে অন্তর থেকে প্রশংসা করতেই হবে। এই ভাষায় আর একটু মননের গভীরতা সঞ্চারিত হলে তাঁর গদ্য প্রবন্ধ নিবন্ধের আদর্শ ভাষা হতে পারত।৭৯

নিবন্ধের আদর্শ ভাষারূপে ব্যাপকভাবে অনুসৃত না হলেও হরপ্রসাদের ভাষারীতি পরবর্তী প্রজন্মের অন্তত দুজন গদ্যশিল্পীকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। বিবেকানন্দ ও অবনীন্দ্রনাথের রচনা তার প্রমাণ। বিবেকানন্দের (১৮৬২-১৯০২) অল্পসংখ্যক বাংলা রচনার ভাষা আবেগ উচ্ছ্বাসহীন অথচ বুদ্ধিদীপ্ত। তাতে সরল মুখের ভাষার ঘরোয়া স্নিগ্ধতা আছে। বাংলাভাষা সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব চিন্তা ছিল। "বাঙ্গালা ভাষা"৮০ নামক ক্ষুদ্র নিবন্ধে বাংলা ভাষায় যাতে উন্নত দর্শন, বিজ্ঞান চিন্তা হয় তার জন্য যুক্তি দেখিয়েছেন যে,

> বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত যাঁরা 'লোকহিতায়' এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন।

> পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট; কিন্তু কটমট ভাষা, যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? ···ভাষাকে করতে হবে—যেন সাফ্ ইস্পাৎ, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর——আবার যে-কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতির গদাই-লস্করি চাল—ঐ এক চাল—নকল করে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়, লক্ষণ।[৮১]

ভাষা বিষয়ে সর্বপ্রকার সংস্কারমুক্ত চিন্তার সঙ্গে তেমনি ভাষার নমুনাও পাওয়া গেল। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' নামক মৌলিক রচনাটির প্রথম কয়েকটি অনুচ্ছেদ বাদ দিলে পুরোটাই বিবেকানন্দের কথ্য, শ্লেষপূর্ণ হালকা মেজাজের ভাষার অনবদ্য দৃষ্টান্ত। বলা যায় হরপ্রসাদের মত তাঁর ভাষাও অননুকরণীয়, বিচ্ছিন্ন একটি ধারা সৃষ্টি করে বাংলা ভাষার সম্ভাবনাময় প্রাণে ঐশ্বর্য সঞ্চার করেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় জাতির তুলনা প্রসঙ্গে তিনি এক জায়গায় বলছেন,

> কোন্ বেদে কোন্ সূক্তে, কোথায় দেখছ যে, আর্যরা কোন্ বিদেশ থেকে এদেশে এসেছে? কোথায় পাচ্ছ যে, তাঁরা বুনোদের মেরে কেটে ফেলেছেন? খামকা আহাম্মকির দরকারটা কি? আর রামায়ণ পড়াতো হয় নি; খামকা এক বৃহৎ গল্প—রামায়ণের উপর—কেন বানাচ্ছ?[৮২]

বিবেকানন্দের রচনার ভাষায় সরল মুখের ভাষার সঙ্গে উপদেশনার ভঙ্গি ও শ্লেষ মিশ্রিত হয়ে নতুন ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয়েছে।

তেমনি অবনীন্দ্রনাথের (১৮৭১-১৯৫১) খেয়ালি সৃষ্টির তৎসম শব্দ-বর্জিত কথ্যভাষা শিশুপাঠ্য রচনার অন্তর্গত হয়েও বাংলা সাহিত্যে এবং গদ্যের ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। গভীর মননের সঙ্গে সম্পর্কিত' বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' এবং 'বাংলার ব্রত' বিষয়ের কারণে অপেক্ষাকৃত গুরু-গম্ভীর ভাষায় রচিত হলেও তার ভেতরের কাঠামো একই।

অবনীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ও শিল্পীমনের সারাৎসার তাঁর গদ্যশৈলীতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। তাঁর একান্ত ভারতীয় মন বাইরের প্রভাবের সব-

কিছুকে আড়াল করে তাঁর রচনায় উঠে এসেছে। "ঘরোয়া' ও 'জোড়াসাঁকোর ধারে' একান্তভাবে স্বকাল এবং জীবনের ঘটনা পরিপূর্ণ হয়েও তাঁর পর্যবেক্ষণ ও বর্ণনার গুণে স্মৃতিমেদুর ইতিহাসে পরিণত হয়েছে।

অবনীন্দ্রনাথের ভাষা হরপ্রসাদের ভাষা অতিক্রম করে আরো অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিল, কিন্তু ভাষার মূল কাঠামোয় উভয়ের মিল স্পষ্ট। যেমন 'শকুন্তলা'র ভাষা :

> মালিনীর জল বড় স্থির—আয়নার মত। তাতে গাছের ছায়া, নীল আকাশের ছায়া, রাঙা মেঘের ছায়া—সকলি দেখা যেত।...সেই আশ্রমে জটাধারী তপস্বী কণ্ব আর মা-গৌতমী ছিলেন, তাঁদের পাতার কুটির ছিল, পরনে বাকল ছিল, গোয়াল ভরা গাই ছিল, চঞ্চল বাছুর ছিল, আর ছিল বাকলপরা কতকগুলি ঋষিকুমার।[৮৩]

রূপকথা ও কথকতার ভঙ্গিতে বাক্যের শেষে একই ক্রিয়াপদ বার বার ব্যবহার করেছেন অবনীন্দ্রনাথও। হরপ্রসাদ যে গম্ভীর বিষয়েও প্রায় একই ভঙ্গি ব্যবহার করেছেন তাঁর রচনার উদ্ধৃত অংশে তা আমরা দেখিয়েছি।

হরপ্রসাদের জীবৎকালে আরো দুজন ব্যতিক্রমী গদ্যশিল্পীর আবির্ভাব হয়েছিল ; দুজনেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিভার ছাপ রেখে গেছেন। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০-১৮৯৯) ও রাজশেখর বসু'র (১৮৮০-১৯৬০) রচনার বিষয় ও শৈলীর সঙ্গে হরপ্রসাদের ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে দেখা যায়। হরপ্রসাদের পরে বাংলায় কালিদাসের কাব্যব্যাখ্যায় বলেন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ভাষা হরপ্রসাদের মত নির্ভার অনাড়ম্বর নয়। বলেন্দ্রনাথের ভাষা হচ্ছে :

> শব্দাঢ্য বর্ণাঢ্য অলংকৃত উপমাবহুল...। তাঁহার ভাষা রাজকন্যার বহুরত্নাদিভূষিত নানাচিত্রাদিসুশোভিত কারুকার্যের মহিমায় উজ্জ্বল শিবিকার মত;...শিবিকার সৌন্দর্যেই চক্ষু ধন্য হইয়া যায়—[৮৪]

অন্যদিকে আমরা দেখি বিবেকানন্দ ও অবনীন্দ্রনাথের মত রাজশেখর বসুর ভাষা সর্বত্র বিশিষ্ট ও অনবদ্য। তিনিও হরপ্রসাদের মত সাধুরীতিতেই তাঁর বহু হাস্যরসাত্মক রচনা লিখেছেন।

> রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর ভাষারীতিকে এড়িয়ে সাধুভাষার এই পদক্ষেপ সত্যই বিস্ময়জনক। বস্তুতঃ পড়বার সময়ে খেয়াল থাকে না এ-ভাষা সাধু কি কথ্য, পরে হিসাবে দেখা যায় সাধুভাষা।[৮৫]

অনুরূপ মন্তব্য হরপ্রসাদের রচনা সম্পর্কেও করা যায়। রাজশেখরের বিষয় ছিল হাস্যকৌতুকময়; অন্যদিকে হরপ্রসাদের বিষয়-বৈচিত্র্যের গাম্ভীর্য বিস্তৃত ও ব্যাপক। তা সত্ত্বেও হরপ্রসাদের রচনায় সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম থেকে মুক্তির পরিচয় পাওয়া যায় প্রধানত স্ত্রী প্রত্যয়ের ন্যূনতম ব্যবহারে, বাংলা বহুবচন-বিভক্তি ও নির্দেশকের প্রয়োগে এবং গতানুগতিক অলংকার-পরিহারে। ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করলেও ইংরেজি ছাঁদের বাক্য বোধহয় হরপ্রসাদ ব্যবহার করেন নি।

তিনি সবুজপত্র-যুগের রবীন্দ্র-গদ্য এবং সম্ভবত প্রমথ চৌধুরীর চলতি গদ্যের আদর্শের প্রতি বিরূপ ছিলেন, একথা মনে হয়। ভাষারীতির যে আদর্শ তাঁর মনে কাজ করেছিল, তা মধ্যপর্বের বঙ্কিমী উপন্যাস, কমলাকান্ত প্রভৃতি ও দ্বিজেন্দ্রনাথের কথ্যভাষার প্রভাবজাত হতে পারে। সেই সঙ্গে পূর্বোল্লিখিত বিষয়ী লোকের ভাষার আদর্শ তিনি বিশেষভাবে মনে রেখে ছিলেন। তাঁর রচনাভঙ্গি ও গদ্যরীতি সম্বন্ধে সমালোচকের মন্তব্য এই যে,

> তিনি প্রতিবাদকে কখনও উত্তপ্ত করে তোলেন না, সমর্থনকে কখনও আবেগ চঞ্চল করেন না। তিনি নিজে যেমন, তাঁর গদ্যও তেমন—সপ্রাণ অথচ নিরুচ্ছ্বাস।[৮৬]

এই সপ্রাণ, নিরুচ্ছ্বাস সাধনা তাঁর নৈয়ায়িক মনের পরিচায়ক। এই সাধনাকেই আবার কেউ কেউ উনিশ শতকীয় নবজাগরণের ধারক মধুসূদন, দীনবন্ধুর সাহিত্যরচনা ও বিদ্যাসাগরের জীবন ও কর্মের সঙ্গে যুক্ত করে বলেছেন, "গদ্যরীতি চর্চার নিজস্ব চারিত্রেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আমাদের রেনেশাসেঁর সেই ধারার নমস্য উত্তরসাধক।"[৮৭]

তথ্যনির্দেশ

১ "বাংলা ভাষা" সত্যজিৎ চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনাসংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড (কলিকাতা ১৯৮১) পৃষ্ঠা ৫৬২

২ সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য' (পঞ্চম সংস্করণ), কলিকাতা ১৩৮৩), পৃ. ৪-৮

৩ আনিসুজ্জামান, 'পুরোণো বাংলা গদ্য' (ঢাকা, ১৯৮৪), পৃ. ৫১-৫২

৪ ঐ, পৃ. ৬৬

৫ ঐ. পৃ. ৬৯

৬ দেবেশ রায়, 'আঠার শতকের বাংলা গদ্য' (কলিকাতা, ১৯৮৭), পৃ. ১৮

৭ আনিসুজ্জামান, পৃ. ৮৯

৮ "বাংলা ভাষা", 'রচনাসংগ্রহ' (২), পৃ. ৫৬৩

৯ সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্য গদ্য', পৃ. ১২৮

১০ ঐ; 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,' দ্বিতীয় খণ্ড, (চতুর্থ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৬৯), পৃ. ২৬৮

১১ প্রমথনাথ বিশী ও বিজিতকুমার দত্ত (সম্পাদিত), 'বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক' (কলিকাতা, ১৩৬৭), পৃ. ১৩

১২ 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনাসংগ্রহ', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫৬৩

১৩ ঐ, পৃ. ৩৬৯

১৪ ঐ, পৃ. ৩৬৯

১৫ ঐ, পৃ. ৫৯৬

১৬ ঐ, পৃ. ৫৯৮

১৭ ঐ, পৃ. ৬০১

১৮ ঐ, পৃ. ৬০১-৬০২

১৯ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য; 'মধ্য বাঙ্গালা ব্যাকরণ', প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড (পুনর্মুদ্রণ), কলিকাতা, ১৯৭৬), পৃ. ৩১

২০ 'হরপ্রসাদশাস্ত্রী রচনাসংগ্রহ', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬০৪

২১ ঐ, পৃ. ৬০৫

২২ ঐ; পৃ. ৬০৩

২৩ ঐ, পৃ. ৫৬১

২৪ ঐ, পৃ. ৫৬৪

২৫ ঐ, পৃ. ১৯

২৬ ব্যক্তিগত সাক্ষাতের সময়ে ২৫ জানুয়ারী, ১৯৮৬, সুকুমার সেনের উক্তি।

২৭ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গীতা পাঠ', (পুনর্মুদ্রণ, কলিকাতা, ১৯৭৩), পৃ. ২৫৫

২৮ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অনিলকুমার কাঞ্জিলাল (সম্পাদিত). 'হরপ্রসাদ—রচনাবলী', প্রথম সম্ভার (কলিকাতা, ১৯৬৩). পৃ. ৫১
২৯ "ভারতমহিলা", পৃ. ৩৬
৩০ সত্যজিৎ চৌধুরী ও অন্যান্য (সম্পাদিত), 'হরপ্রসাদ রচনাসংগ্রহ' প্রথম খণ্ড (কলিকাতা, ১৯৮০), পৃ. ৪
৩১ ঐ, পৃ. ১৪-১৫
৩২ ঐ, পৃ. ৮১
৩৩ ঐ, পৃ. ৮২
৩৪ ঐ, পৃ. ৪৯০-৪৯১
৩৫ 'হরপ্রসাদ—গ্রন্থাবলী' (বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা, তারিখবিহীন), পৃ. ৩১৭
৩৬ ঐ, পৃ. ৩১৭
৩৭ "সাবেক মনুষ্যত্ব" ও "হালের সাইন করা", ঐ, পৃ. ৩১৮
৩৮ "উর্ব্বশী বিদায়", হরপ্রসাদ রচনাবলী', প্রথম সম্ভার, পৃ. ৫৩১
৩৯ "পার্ব্বতীর প্রণয়", ঐ, পৃ. ৫২১
৪০ "বিরহে পাগল", ঐ, পৃ. ৫৩৫
৪১ "বাংলা সাহিত্য", 'হরপ্রসাদ-রচনাসংগ্রহ', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৭৪২-৭৪৩
৪২ "বাংলা ব্যাকরণ", ঐ, পৃ. ৬০১
৪৩ "কালিদাসের বসন্ত—বর্ণনা", "হরপ্রসাদ রচনাবলী,' প্রথম সম্ভার, পৃ. ৫০৪
৪৪ "বেনের মেয়ে", 'হরপ্রসাদ-রচনাসংগ্রহ', প্রথম খণ্ড, পৃ. ২০৮
৪৫ "কালিদাসের বসন্ত-বর্ণনা", 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী,' ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০৪
৪৬ "শকুন্তলার মা", ঐ, পৃ. ৫৪৭
৪৭ "বিরহে পাগল", ঐ, পৃ. ৫৪৭
৪৮ "দুর্ব্বাসার শাপ", ঐ, পৃ. ৫৫৩
৪৯ "অভিভাষণ-১" 'হরপ্রসাদ-রচনাসংগ্রহ', ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৭
৫০ "বাংলার বৌদ্ধসমাজ", সত্যজিৎ চৌধুরী ও অন্যান্য (সম্পাদিত), 'হরপ্রসাদ-রচনাসম্ভার,' তৃতীয় খণ্ড (কলিকাতা, ১৯৮৪), পৃ. ৫৭৭
৫১ ঐ, পৃ. ৫৮৯
৫২ 'বেনের মেয়ে', 'হরপ্রসাদ-রচনাসংগ্রহ' ২য় খণ্ড, পৃ. ২২১
৫৩ "বাংলার বৌদ্ধসমাজ", 'হরপ্রসাদ-রচনাসংগ্রহ', তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৫৯২

৫৪ 'কাঞ্চনমালা', 'হরপ্রসাদ-রচনাসংগ্রহ', ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৮
৫৫ 'কাঞ্চনমালা', ঐ, পৃ. ১৩৪
৫৬ ঐ, পৃ. ১৪১
৫৭ 'বেনের মেয়ে', ঐ, পৃ. ২৭১
৫৮ ঐ, পৃ. ২১১
৫৯ ঐ, পৃ. ২৩০
৬০ 'বেনের মেয়ে', ঐ, পৃ. ২৩২
৬১ ঐ, পৃ. ৩৬৮
৬২ "অভিভাষণ"-৩, 'হরপ্রসাদ রচনাসংগ্রহ' ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৫
৬৩ "বাংলা ব্যাকরণ", ঐ, পৃ. ৬০২
৬৪ "বাংলা সাহিত্য বর্তমান শতাব্দীর", ঐ, পৃ. ৫০৩
৬৫ "কালেজী-শিক্ষা", 'হরপ্রসাদ-গ্রন্থাবলী,' পৃ. ৩২১
৬৬ হরপ্রসাদ রচনাবলী', প্রথম সম্ভার, পৃ. ৯৪-৯৫
৬৭ 'হরপ্রসাদ রচনাসংগ্রহ', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫০৭
৬৮ 'হরপ্রসাদ-রচনাসংগ্রহ', তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৩৯
৬৯ "হীনযান ও মহাযান", পৃ. ৩২৪
৭০ 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী'; প্রথম সম্ভার পৃ. চ
৭১ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী; "দুষ্মন্তের ভাঁড় মাধব্য", 'নারায়ণ', অগ্রহায়ণ, ১৩২৪
৭২ 'বেনের মেয়ে', 'হরপ্রসাদ-রচনাসংগ্রহ', প্রথম খণ্ড, পৃ. ২০১-২০২
৭৩ ঐ, পৃ. ২৭৪
৭৪ ঐ, পৃ. ৩৮৮
৭৫ প্রমথনাথ বিশী, 'বাংলার লেখক' (কলিকাতা, ১৩৫৭), পৃ. ৫৭
৭৬ ঐ, পৃ. ৫৪
৭৭ সত্যজিৎ চৌধুরী ও অন্যান্য (সম্পাদিত) 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মারকগ্রন্থ' (কলিকাতা, ১৯৭৮); পৃ. ৩১২
৭৮ ঐ, পৃ. ২৮৫
৭৯ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' (কলিকাতা, ১৩৭৮), পৃ. ৫৮০
৮০ ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে ২০ ফেব্রুয়ারী বিবেকানন্দ লস-এঞ্জেলস্ থেকে রামকৃষ্ণ মঠ পরিচালিত 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদককে যে চিঠি

লেখেন, তা থেকে মুদ্রিত। স্বামী বিবেকানন্দ, ভাব্বার কথা' (দ্বাদশ সংস্করণ; কলিকাতা, ১৩৬৯)

৮১ ঐ, পৃ. ৯–১০

৮২ স্বামী বিবেকানন্দ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' (বিংশ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৭৬), পৃ. ১১৩

৮৩ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর,' 'শকুন্তলা' (বিংশ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৯০), পৃ. ৫–৬

৮৪ প্রমথনাথ বিশী, 'বাংলার লেখক', পৃ. ৮৬

৮৫ প্রমথনাথ বিশী (সম্পাদিত), ', পরশুরাম গ্রন্থাবলী' (দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৮৩), পৃ. ২৯

৮৬ 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মারকগ্রন্থ', পৃ. ২৮৩

৮৭ ঐ, পৃ. ৩১৩